প্রথম অধ্যায়
উপসমিতি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা

পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিগত পঁচিশ বছরে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব শুধু যে পরিমাণে বেড়েছে তাই নয়, গ্রামের মানুষের ভাল থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সব দায়িত্ব একটু একটু করে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।

এই বিশাল কর্মকান্ড যে শুধু প্রধান, উপপ্রধান বা দু-একজন সদস্যের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়, একথাও ভাবা হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। এর জন্য চাই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাগ করে নেওয়া যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে আরও গতিশীল করতে পারেন।

- অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ
- পূর্তকার্য্য ও পরিবহন
- কৃষি, সেচ ও সমবায়
- শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া
- শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ
- বন ও ভূমি সংস্কার
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ
- খাদ্য ও সরবরাহ
- ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি

এদের বিষয়গুলি সরকারী দপ্তরগুলির বিষয় বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় সরকারের সঙ্গে পঞ্চায়েতের যোগাযোগ পদ্ধতিও সহজ হয়েছে। স্থায়ী সমিতিগুলি আইনী কাঠামোর মধ্যে এবং বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ফলে কর্মে যেমন দক্ষতা ও গতি এসেছে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণের নীতিও অনুসৃত হচ্ছে।

কিন্তু নানা কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এতদিন এমন কোন স্থায়ী সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়নি। তবে কাজের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েত আইনের ৩২ক ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের করণীয় কাজগুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করে সদস্য বিশেষকে অথবা কয়েকজন সদস্যের একটি দলের উপর এক বা একাধিক কর্মগুচ্ছের দায়িত্ব অর্পন করে কাজ করতে বলা হয়েছিল। কিন্ত এ ব্যবস্থায় কিছু অপূর্ণতা ছিল যেমন: -

(ক) এই গুচ্ছ বিভাজন আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছিল না, ছিল না বিভাজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও ফলে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিভাজনের সাধারনীকৃত রূপের নিশ্চয়তা ছিল না।

(খ) সদস্য বিশেষের হাতে কোন কাজের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যস্ত হওয়া গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত তার ইচ্ছামতো দায়িত্ব প্রাপ্ত দলগুলির পূণর্গঠন করতে পারতো অথবা ন্যস্ত কর্মের পূনর্বিন্যাস করতে পারতো ফলে দলগুলির গঠনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণে অনিশ্চয়তার পরিবেশ থাকতো।
(ঘ) ঐ দলগুলির হাতে কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তার অর্থসংস্থানের ব্যাপারে প্রধানের উপরই নির্ভরশীল ছিল।
(ঙ) ঐ দলগুলির মিটিং এর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না আইনে। ফলে কোন দল কতগুলি মিটিং করল বা করবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা ছিল না।

বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনের ঐ ৩২ক ধারা সংশোধন করে পাঁচটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতালিকাটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগকে এক একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি প্রায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আদলে হওয়ায় ঐ ঐ বিষয়গুলি ব্যাপারে তিন স্তরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়েছে। এখন কোন একজন সদস্যের হাতে কোন উপসমিতির দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিধান নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত ইচ্ছা করলেই উপসমিতিগুলির কাঠামো পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে তাদের কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকতায় অনিশ্চয়তা থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা অন্য উপসমিতিগুলির সঞ্চালকগণ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির বাধ্যতামূলক সদস্য হওয়ায় অর্থসংস্থান ও বরাদ্দের ব্যাপারে প্রতিটি উপসমিতি সমানাধিকার ভোগ করবে। এটাও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে একটা বিশেষ পদক্ষেপ। এখন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে উপসমিতির পরামর্শ মত অর্থবরাদ্দ করা প্রধানের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ৩২ক ধারায় গঠিত দলগুলিতে সরকারী আধিকারিক এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। ফলে ঐ দলগুলির পক্ষে সময়মতো এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ পাবার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু এখনকার উপসমিতিগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে উপসমিতিগুলির কাজকর্মে গতি ও দক্ষতা বাড়বে।

অর্থাৎ একদিকে সরকারের বিশেষজ্ঞ আধিকারিক অন্যদিকে গ্রামের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আরও মজবুত হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তি, স্থানীয় উন্নয়ন স্থানীয়ভাবেই করে ফেলা যাবে এবং প্রধান বা উপপ্রধান এতকাল যে দায়িত্ব একক বা যুগ্মভাবে পালন করতেন তা আরও দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে করা যাবে এই দায়িত্ব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ফলে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই উপসমিতির গঠন ও দায়-দায়িত্বের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপসমিতির গঠন, ক্ষমতা, দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়তে ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছের সংগঠন হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। এই স্তরে কাজ এবং দায়িত্ব ও ভাগ করে নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইনে উপসমিতি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট পাঁচটি উপসমিতি থাকবে। এগুলি হোল: (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, (৩) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, (৪) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, (৫) শিল্প ও পরিকাঠামো। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত উপসমিতি গঠন করতে পারে।

উপসমিতির গঠন: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভার (সরকারীভাবে ডাকা) তিন মাসের মধ্যে উপসমিতি গঠন করতে হবে। উপসমিতির সদস্য হবেন-

(১) প্রধান ও উপপ্রধান (পদাধিকার বলে) এবং

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং পদাধিকার বলে সদস্যদের (পঞ্চায়েত সমিতির) মধ্যে থেকে অনাধিক তিনজন।

এই তিনজনকে নির্বাচিত করতে হবে সরকারীভাবে ডাকা একটি সভায়।

তবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির জন্য কোনো সদস্য নির্বাচিত হবেন না। অন্যান্য উপসমিতির সঞ্চালকরাই অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে, সেই দলের নেতা অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই বা তার বেশী স্বীকৃত জাতীয় দল বা রাজ্য দলের বিরোধী সদস্য সংখ্যা সমান হয় তবে যেক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলের যে ক্রমবিন্যাস ঠিক করে দেবেন, তা অনুসরন করে জাতীয় দলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যদি কোনো স্বীকৃত বিরোধী দলের সদস্য না থাকেন সে ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত বয়জ্যোষ্ঠ বিরোধী নির্দল সদস্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার

আদেশ করে কোনো উপসমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন।

নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা।

উপসমিতির সদস্য সংখ্যা: -

প্রত্যেক উপসমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে এইরকম:

পদাধিকারবলে (পঞ্চায়েত সমিতির) সদস্যসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা	উপসমিতির সদস্য
(ক) ১০ এবং তার কম	১
(খ) ১১ থেকে ২০	২
(গ) ২১ এবং তার বেশী	৩

প্রধান এবং উপপ্রধান ছাড়া অপর কোনো সদস্য একসাথে দুটির বেশী উপসমিতির সদস্য হবেন না।

সঞ্চালক: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য একজন সঞ্চালক নির্বাচিত হবেন। উপসমিতির সদস্য নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি বাদে অন্যান্য উপসমিতির সদস্যরা (কোন নির্বাচিত) একটি সভায় (সরকারীভাবে ডাকা) নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সঞ্চালক নির্বাচিত করবেন।

প্রধান, অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি এবং অপর যে কোনো একটি উপসমিতি ছাড়া অনো কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হবেন না।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির সঞ্চালক হবেন একজন মহিলা।

সঞ্চালক অথবা সদস্যের পদত্যাগ: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্য লিখিতভাবে প্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারেন। ঐ পদত্যাগপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় গৃহীত হলে ঐ উপসমিতির সঞ্চালকের পদ শূণ্য হবে।

আকস্মিক শূন্যতা: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্যপদে পদত্যাগ। মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্যতা দেখা দিলে ঐ উপসমিতির সদস্যরা প্রথম উপসমিতি গঠনের বা সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়মেই ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। যিনি এইভাবে এইভাবে নির্বাচিত হবেন, তিনি পঞ্চায়েতের কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করবেন।

উপসমিতির ক্ষমতা: -

প্রত্যেক উপসমিতি তার নিজস্ব বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটের সীমার মধ্যে প্রকল্প প্রনয়ন ও রূপায়ন করবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে দায়িত্ব দেবে উপসমিতি ঐ সেই দায়িত্ব পালন করবে।

এই কাজ করতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে উপসমিতির যে আর্থিক সীমা নির্দিষ্ট করবেন উপসমিতিকে সেই সীমার মধ্যেই প্রকল্প বা কাজকর্ম রূপায়ন করতে হবে।

প্রত্যেক উপসমিতি তার আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত প্রতিটি খরচের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে সুপারিশ সহ দাখিল করবে এবং এক্ষেত্রে উপসমিতির দায়িত্ব হবে সেই সকল বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত মেনে কর্মসূচী রূপায়ন করা।

কর্মসূচী রূপায়নের আগে প্রত্যেক উপসমিতি অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির আর্থিক অনুমোদন নেবে।

কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে বাজেট বরাদ্দ করবে, উপসমিতি সেই বাজেট বরাদ্দ কোনো ভাবেই পরিবর্তন করতে পারবেন না।

উপসমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য: -

যখন রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রনয়নের দায়িত্ব দেবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে কিভাবে ঐ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে উপসমিতি সেই নির্দেশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে প্রকল্প ও প্রাককলন প্রস্তুত করে কর্মসূচী রূপায়ন করবে।

উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক

উপসমিতির নাম	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক
অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, রাজস্ব পরিদর্শক।
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক, মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক, সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম শিক্ষা সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারী ধাত্রী সেবিকা (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঘ) নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা (আমন্ত্রিত সদস্য) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক, রাজস্ব পরিদর্শক।

উপসমিতির সচিব: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মচারী উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিভিন্ন উপসমিতির সচিব নির্দিষ্ট

করতে হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই অর্থ ও পরিকল্পনা এবং যে উপসমিতির সচিবের পদ শূন্য হবে সেই উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

উপসমিতি যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে

উপসমিতি	বিষয়
অর্থ ও পরিকল্পনা	অর্থ, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষা, কর, সম্পদ সংগ্রহ, সংস্থা, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রনয়ন, বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ন ও তদারকি, পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, দুর্যোগ মোকাবিলা, হাট, বাজার, ফেরী পরিচালনা, অন্যান্য উপসমিতির কাজের সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা অন্য কোনো উপসমিতিকে দেওয়া হয়নি।
কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	কৃষি, সব্জি ও ফলচাষ, সেচ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য, দলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	সাক্ষরতা প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী, জনশিক্ষা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী।
নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প।
শিল্প ও পরিকাঠামো	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ।

তৃতীয় অধ্যায়
উপসমিতির সভা

উপসমিতির সভাগুলি হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ে। প্রতি দুই মাস অন্ততঃ একটি সভা ডাকতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে উপসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানকে জানিয়ে রেখে একাধিক সভাও করা যেতে পারে। সভার তারিখ এবং সময় ঠিক করবেন সঞ্চালক।

যদি কোনো কারণে সঞ্চালক সভা ডাকতে না পারেন তবে প্রধান সেই উপসমিতির সভা ডাকবেন। কিন্তু প্রধান পরপর তিনটির বেশী সভা ডাকতে পারবেন না।

সভার আলোচ্য সূচী: - সঞ্চালকের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সভার আলোচ্যসূচী ঠিক করবেন। প্রয়োজনে সঞ্চালক লিখিতভাবেও এ বিষয়ে সচিবকে নির্দেশ দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক সভারই প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করা।

সভার নোটিশ: -

সভার দিনক্ষণ, আলোচ্যসূচী সম্বলিত নোটিশ স্বাক্ষর করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সচিব এবং তা বার্তাবহ অর্থাৎ পঞ্চায়েত কর্মীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভার নোটিশ বিলি করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। সভার নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডেও ঝুলিয়ে দিতে হবে, যে তারিখে নোটিশটি স্বাক্ষর করা হচ্ছে সেই তারিখেই।

সাধারনভাবে সাতদিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে হবে। তবে জরুরী সভা তিন দিনের

নোটিশে ডাকা যাবে। জরুরী সভায় একটি বিষয়ই আলোচ্যসূচী হিসাবে রাখা যাবে।

কোরাম: -

নির্বাচিত অন্ততঃ দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকলে তবেই সভার কোরাম হবে এবং সভার কাজ শুরু করা যাবে।

সভা কখন মূলতবী হবে: -

প্রধানতঃ দুটি কারণে সভা মূলতবী হতে পারে। প্রথমতঃ যদি দেখা যায় যে কোনো একজন সদস্য সভার নোটিশ পাননি, এবং দ্বিতীয়তঃ সভা শুরুর নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পরেও কোরাম না হয়।

ঐ সভা সাতদিন পরে আর একটি তারিখ এবং সময়ে (যা সঞ্চালক স্থির করে দেবেন) একই স্থানে একই আলোচ্যসূচী নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভার সভাপতি: -

উপসমিতির সব সভাতেই সভাপতিত্ব করবেন সঞ্চালক। কোনো কারণে তিনি উপস্থিত না থাকলে অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবেন।

সভার হাজিরা বই: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য সভার একটি হাজিরা বই রাখতে হবে। এই হাজিরা বইতে সকল সদস্যই স্বাক্ষর করবেন বা বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের টিপ দেবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী: -

সভার কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে এই উদ্দেশ্যে রাখা একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এবং সভা শেষ হবার আগেই তা উপস্থিত সকলকে পড়ে কেনাতে হবে। সবশেষে সভার সভাপতি সেই কার্য্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী লিখবেন উপসমিতির সচিব অথবা পঞ্চায়েতের সচিব তাদের কেউ না থাকলে সঞ্চালকের নির্দেশ অনুযায়ী অপর কোনো কর্মচারী কিংবা সংশ্লিষ্ট উপসমিতির কোনো সদস্য এই দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। পার্থক্য এলাকায় নেপালী ভাষাতেও লেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি: -

আলোচ্য বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ/বা দ্বিমত থাকলে সেই বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে।

উপসমিতির সভার হাজিরা খাতার নিদর্শ

(১) সভার তারিখ____________________________

(২) সভার স্থান____________________________

(৩) সভার সময়____________________________

(৪)কি ধরনের সভা ____________________সাধারন/ বিশেষ/ জরুরী

সদস্যদের নাম	সদস্যের স্বাক্ষর /টিপসই	উপস্থিত হবার সময়	যার দ্বার প্রত্যয়িত (নিরক্ষর সদস্যের ক্ষেত্রে)

- অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন।

উপসমিতির সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_____________________________তারিখে সকাল/ বিকাল______________________ টার সময় ___________________________(স্থান) -এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________________

(২) ______________________________

(৩) ______________________________

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

উপসমিতির জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

....উপসমিতি

প্রতি

____

____

মাননীয়,

নিম্নলিখিত বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_______________________তারিখ সকাল/ বিকাল______________________টার সময়_____________________________(স্থান)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) ______________________________

তারিখ: সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

চতুর্থ অধ্যায়

উপসমিতির কাজকর্মের পদ্ধতি

গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন অনেক বাড়তি কাজের চাপ। যেমন, এলাকার শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মূল বিষয়গুলি বোঝা এবং সবাইকে সামিল করা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা, এলাকার শিশুমৃত্যু রোধ করা, সমস্ত শিশুর জন্য রোগ প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করা, শিশুদের অপুষ্টি দূর করা, এলাকায় ডায়রিয়া রোধ করা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, বিদ্যালয়ছুট শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে প্রথাগত কিছু উন্নয়নের কাজ। যেমন এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় গৃহ ইত্যাদি সংস্কার, দারিদ্র্যদূরীকরণ

কর্মসূচী রূপায়ন, গ্রামীণ আবাসন ইত্যাদি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এইসব কাজকর্মের কতকগুলি যেমন সরাসরি রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, তেমনি কতকগুলি দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে সরকারী কয়েকটি দপ্তর। পঞ্চায়েত সেখানে সমন্বয়ের কাজটা করে থাকে। এই সমন্বয় বা রূপায়ন যে কাজটাই পঞ্চায়েত করুকনা কেন এগুলিকে যদি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচী হিসাবে দেখা হয় তো তার রূপায়ন হবে একরকম আর যদি নীচেকার চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হয় তবে তার রূপায়ন হবে আর এক রকম।

আমাদের চলতি ভাবনায় আমরা এতকাল পঞ্চায়েত বেশীর কাজকেই দেখেছি ন্যস্ত দায়িত্ব হিসাবে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সবচেয়ে উদ্বেগ এসেছে দ্রুত সরকারী অর্থ ব্যয় করে তার সদ্ব্যবহার পাঠানোর বিষয়ে। তাই যে কাজগুলো পঞ্চায়েত করছে তার কতটা এলাকার আসল সমস্যাগুলো মেটাতে পারছে বা সেই কাজে এলাকার মানুষকে কতটা পাওয়া যাচ্ছে কিম্বা এলাকায় যে সব সম্পদ রয়েছে (যেমন গাছপালা, নদী, অরন্য, পশু, পাখী কিম্বা মানুষ) তাদেরই বা কতটা কাজে লাগানো যাচ্ছে এনিয়ে চিন্তাভাবনার খুব বেশী অবকাশ পাওয়া যায়নি। আবার যখন খুব দ্রুত উপর থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিম্বা হঠাৎ করে কোনো একটি প্রকল্পে কিছু উপভোক্তা বেছে দিতে বলা হয়েছে তখনও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে, এই চয়ন বা নির্বাচন কোথাও কোথাও হয়েছে একপেশে। হয়ত আর একটু খুঁজলে যাদের নাম পাঠানো হলো তাদের চেয়েও জরুরী কিছু নাম পাওয়া যেত। এ সবের কারণ হোল হাতের কাছে পঞ্চায়েতের কর্মসূচী প্রনয়নের মত তথ্যভান্ডার না থাকা। আর একটু অন্যভাবে বললে যেটা দাঁড়ায় তো হোল সরকারী কর্মসূচী রূপায়নের বদলে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীতে সরকারী কর্মসূচীতে কাজে লাগানো।

উপসমিতির গঠনের উদ্দেশ্য তাই নিছক প্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে ভাগ করে নেওয়া বা নতুন কিছু ক্ষমতার আনন্দে মেতে ওঠা নয়, উপসমিতির আসল উদ্দেশ্য হোল এই সরকারী কর্মসূচীর সঙ্গে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর মিল ঘটানো, কর্মসূচীর অগ্রাধিকার ঠিক করা, কর্মসূচী রূপায়নে সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনার খতিয়ান তৈরী করা এবং এই সব কাজের সমন্বয় ঘটানোর জন্য স্থানীয় উৎসাহী মানুষজনকে কাজে লাগানো।

উপসমিতির তথ্যভান্ডার: - কোন উপসমিতির কী কাজ সে বিষয়ে আগের অধ্যায়ে একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিষয়গুলিতে যেমন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতে প্রতিদিন অনেক চিঠিপত্র আসে তেমনি আবার এলাকার মানুষজনের কাছ থেকেও অনেক কাগজপত্র পাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত চিঠিপত্রই সবার আগে দেখেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তাঁর কাজ হোল কোন চিঠিটি কোন উপসমিতি সংক্রান্ত তা আগে ভাল করে বুঝে নেওয়া, প্রয়োজনে পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের সাহায্যে নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট চিঠিটি সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকের কাছে পাঠানো। আবার অনেক সময় এমনও হতে পারে যে কোনো উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত কোনো আধিকারিক/কর্মচারী তাঁর দপ্তরগতভাবে একটি চিঠি পেয়েছেন, যা আলোচনা করতে হবে উপসমিতির সভায়। এইসব চিঠিপত্র একত্রিত করেই সঞ্চালককে তৈরী করতে হবে উপসমিতির আলোচ্যসূচী।

এই আলোচ্যসূচীর কোনোটি হয়ত চট্‌জলদি সমাধান করা যাবে আবার কোনোটি একটু দীর্ঘমেয়াদী। কোনোটির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামগ্রী হয়ত ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতে মজুদ আছে

আবার কোনোটির জন্য এই অর্থ বা সামগ্রী কিম্বা উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ বা সৃষ্টি তৈরী করার দরকার হতে পারে। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, মনে রাখা দরকার হঠাৎ করে খাবলে নিয়ে কিছু কর্মসূচী রূপায়ন করলে দ্রুত পঞ্চায়েতের অর্থ ব্যয় হতে পারে, স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সবার আগে দরকার উপসমিতির বিষয়ভিত্তিক সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি তথ্য তালিকা। ধরা যাক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির কথা। সরকারীভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র খোলার একটি কোটা বেঁধে দেওয়া হোল এবং বলা হোল আগামী সাতদিনের মধ্যে ঐ কেন্দ্র খুলে উপরে জানাতে হবে। প্রশ্ন হোল উপসমিতি কি ঐ বেঁধে দেওয়া কেন্দ্রগুলিতেই সন্তুষ্ট থাকবে না কি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ঠিক করবে এবং সরকারকে সেই অনুযায়ী অনুমোদন দেবার কথা বলবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল যদি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্র খুলতে হয় তবে জানতে হবে কোথায় কোথায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশী, কোথায় কেন্দ্র খুললে তা বাস্তবে চালু থাকবে এবং কেন্দ্র চালাবার উপযোগী স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। এরকম সমস্যা স্বাস্থ্য নিয়েও হতে পারে। গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে কিম্বা গ্রামে শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে। যে বিষয়েই হোক না কেন যদি হাতে গরামের ঐ বিষয়গুলোর ছবিটা আঁকা থাকে তবে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না অহেতুক বিলম্ব এড়ানো যাবে এবং কাজ হবে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

উপসমিতির সিদ্ধান্তই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত: -

কোনো উপসমিতি সাধারনভাবে কোনো বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভায় অবগত করতে হবে। উপসমিতি যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা রূপায়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে উদ্যোগ নিতে হবে। উপসমিতির সভা পরিচালনা থেকে তার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সব বিষয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন। এক্ষেত্রে সঞ্চালকের কাজ হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপসমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত তদারকি করা।

সঞ্চালকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হোল তার উপসমিতির কাজকর্মের একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রধানের কাছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সাধারন সভায় দাখিল করা।

উপসমিতিকে এটাও মনে রাখতে হবে যে তারা সাধারনভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না যা রূপায়ন করতে অর্থ উপসমিতি বা ব্যাপক অর্থে গ্রামপঞ্চায়েতকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে লিখিতভাবে প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই নিতে হবে। তবেই কাজ হবে দ্রুত অথচ নিয়ম মাফিক।

পাঁচটি উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যা সচল থাকলে গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতই সচল থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি

শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কোন জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র চাষাবাদ, শিল্প বা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্য পিছিয়ে পড়লে

সার্বিকভাবে উন্নয়নের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়।

পঞ্চায়েতীরাজের মূল ধারনাটাই 'বিকেন্দ্রীকরন' এই শব্দটির মধ্যে প্রধানতঃ নিহিত। বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে একদিকে মানুষ যেমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে রাষ্ট্র সহজে মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের কাজগুলো মানুষকে দিয়েই করিয়ে নিতে পারে। শিক্ষা জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে যদি একবারে তৃণমূলস্তর থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ও পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে সার্বিকভাবে এই উদ্যোগ সফল হবে। সেই কারনে আরও বেশী করে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যকে পঞ্চায়েতের আঙ্গিকে ভাবা হচ্ছে।

এই বার ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত সকল স্তরের সদস্যরা/ সদস্যারা শপথ নিয়েছেন এই বলে, যে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার ৫-১৪বছর বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করতে, শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং বিদ্যালয় ছুট রোধ করতে সচেষ্ট হবেন। তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন তাঁর নিজস্ব নির্বাচন এলাকার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে, প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর আওতায় আনতে এবং প্রতি মা ও শিশুকে রোগপ্রতিষেধক টীকাকরণের আওতায় আনতে। সুতরাং, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নের কাজে সামিল হয়েছেন।

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সংশোধনের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে অন্যান্য উপসমিতির সঙ্গে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি গঠনকেও বাধ্যতামূলক করার ফলে আরও সংঘবদ্ধভাবে এই দুটি ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ করার সুযোগ বেড়েছে।

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫.৩৮%, পশ্চিমবঙ্গের ৬৯.২২%। এই রাজ্যে মোট ৯১৯১৮৭১জন ৯ থেকে ১৩ বছরের শিশুর মধ্যে ২৪৫৫৫৪৮জন (১.৪.০৩ অবধি প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী) স্কুলে যায় না,আর ৬০২৪৫০৩জন মাত্র যথাযথ বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হয়। আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন জনবসতির সংখ্য খুব বেশী নয়। অর্থাৎ বেশীর ভাগ জনবসতিতে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্ততঃ আছে কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল। এর ফলে বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যমান পরিকাঠামোর তুলনায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশী হয়ে যায় - স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের চাপের ফলে শিক্ষক ছাত্রের প্রয়োজনীয় অনুপাত অর্থাৎ যতজন পড়ুয়া পিছু একজন শিক্ষক থাকা উচিৎ তা থাকে না। এজন্য শিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগে ৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীরাই সঠিক বানান ও মাত্রা ব্যবহার করে বাংলা লিতে পারছে না। শিক্ষকদের প্রশ্ন করায় তারা জানিয়েছেন দুই বা তিনজন শিক্ষকের পক্ষে শতশত পড়ুয়াদের প্রতি আলাদা করে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব।

এছাড়া আছে শিক্ষায়তনের পরিকাঠামোগত দুর্বলতা পাকা ছাদ না থাকা, ভাঙাচোরা দেওয়াল ও মেঝে, শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকা, - শিক্ষণ সামগ্রী যেমন, বোর্ড, ইত্যাদি না থাকা বইপত্রের সরবরাহে ঘাটতি ইত্যাদি। এসবই শুধু পরিকাঠামোগত সমস্যা; যেগুলো মেটাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু এর থেকেও বড় সমস্যা রয়েছে আমাদের সমাজে বা জনগোষ্ঠীর মধ্যেই যা মেটাতে অর্থের চেয়ে উদ্যোগের প্রয়োজন অনেক বেশী।

এই সামাজিক সমস্যাগুলো হল: -

ক) শিশুশ্রম প্রথা চালু থাকায় দরিদ্র পরিবারের বাবা-মা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাদের আয় কমাতে চান না।

খ) বাবা-মা কাজে গেলে শিশুরা ছোট ভাই-বোনদের দেখভাল করে ফলে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

গ) শিক্ষা যে জীবনে একান্ত জরুরী সেই সমন্ধে সমাজে পিছিয়ে পড়া দুর্বল গোষ্ঠীর অস্পষ্ট ধারণা।

(ঘ) দুর্বলশ্রেণীর মানুষ কায়িক পরিশ্রমকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করবে, এরকম মনোভাব।

(ঙ) নারীশিশুদের ক্ষেত্র -মেয়েদের পড়াশুনা করে কী হবে? মেয়েরা ঘরের কাজ করবে - পড়াশুনা শিখলে নিজস্ব জাতের মধ্যে বিয়ে দেবার জন্য ছেলে পাওয়া যাবে না। এধরনের নানা বিপরীত ধ্যান ধারনা।

(চ) অন্যান্য,

শিক্ষার এই সামাজিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে এমনকিছু সমস্যাও আছে যেগুলির জন্য ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকরা দায়ী। এগুলো হল-

(ক) পিছিয়ে পড়া জনজাতির পড়ুয়ারা লেখা পড়ায় ভালো হবে না এধরনের বদ্ধ ধারনা।
(খ) ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বেশী মনোযোগ - পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের অবহেলা করা।
(গ) শিক্ষাকে আনন্দদায়ক না করে তুলতে পারে - শাসক বা নিয়ন্ত্রক মনোভাব নিয়ে পড়ান - মারধর, গালমন্দ, শাস্তি দেওয়ার ভয়ে অনেক পড়ুয়া লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।
(ঘ) ''তোর দ্বার কিছু হবে না - তুই পারিস না - কিন্তু ও দেখ ও ভাল''- এজাতীয় বকাঝকার মাধ্যমে শিশুমনে নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ও পড়াশুনা সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা।
এভাবে শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোগত অভাব, সামাজিক সমস্যা ও শিক্ষকদের মানসিকতা শিক্ষা প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হল পঞ্চায়েত কীভাবে এবংকতটা এই সমস্যাগুলোর সমাধার করতে পারে?
সমস্যা সমাধানের আগে দেখা যাবে শিশুদের শিক্ষালয়ে পাঠাবার জন্য আমাদের হাতে কী ব্যবস্থা আছে। নীচের ছকটি লক্ষ্য করলে এই বিষয়টি কিছুটা বোধগম্য হবে।

বয়স	শিক্ষা ব্যবস্থা	ব্যবস্থাকারী
৩+ থেকে ৪+ বছর	প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র মূলতঃ খেলাধূলার মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করা (Socialization)
৫+ থেকে ৮+ বছর	প্রাথমিক শিক্ষা	১। প্রাথমিক বিদ্যালয় ২। পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয় দপ্তরের শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ৩। মাদ্রাসা ৪। শিশুশ্রমিক বিদ্যালয় (শুধু শিশু শ্রমিকদের জন্য)
৯+ থেকে ১৩+ বছর	উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা	১। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ২। পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ৩। মাদ্রাসা

এর পরবর্তী বিভাগে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহ। এছাড়াও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় যাতে অষ্টম মানের ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায়।
বর্তমানে শিক্ষাপ্রসারের জন্য যেসব কর্মসূচীগুলি চলছে তা হল: -

সর্বশিক্ষা অভিযান	এর মূল লক্ষ্য ২০১০সালের মধ্যে ৫-১৪বছর বয়সী শিশুর শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করা। এর জন্য গঠিত হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির যৌথ উদ্যোগে এই শিক্ষা অভিযান চলছে সারা দেশে। এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ হবে তার ৬১% শিক্ষার মানোন্নয়ন, ৩৩% পরিকাঠামো ও ৬% প্রকল্প পরিচালনা খাতে ব্যয় হবে।
ডিপিইপি	সর্বশিক্ষার মতন কোন চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা ধারন করা হয় নি। এটির উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা। এটি পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলায় চালু আছে।
শিশুশিক্ষা কর্মসূচী	এই প্রকল্পটি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের হাতে। যে সব শিশু বিদ্যালয়ের সুযোগ পায় না। তাদের সুবিধামাফিক স্থানে বিদ্যালয় গড়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। ১কিমির মধ্যে বিদ্যালয় নেই এমন গ্রামে ২০ জন অভিভাবক চাইলে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।
মাধ্যমিক কর্মসূচী	এটি শিশুশিক্ষার পরবর্তী ধাপ গড়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম মান অবধি ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে। এটি যে কোন গ্রামের ৩কি.মি.র বেশী বিদ্যালয় না থাকলে সেখানে খোলা যায়।
রবীন্দ্র মূক বিদ্যালয়	অষ্টম মানের ওর মাধ্যমিকে বসার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় মারফৎ।

এছাড়াও আছে সাক্ষরতা কর্মসূচী যার মূল উদ্দেশ্য বয়স নির্বিশেষে নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে তোলা।

এবার দেখা যাক এই কর্মসূচীকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নস্তরে শিক্ষা বিস্তারে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সার্বিক শিক্ষার পথে বাধাগুলোকে দূর করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল লক্ষ্য হবে - ১) এলাকার নিরক্ষরকে সাক্ষরতা অভিযানে সামিল করা, ২) নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করার প্রয়াসে সকল শিশুর শিক্ষাকে সার্বজনীন করা।

এরজন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিতে পারে-

১। সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি ঠিক মত চলছে কিনা। সেখানে পড়ুয়ারা আসছে কিনা - না আসলে কেন আসছে না, কীভাবে তাদের বুঝিয়ে এই কেন্দ্রগুলিতে আনা যায় সেই ব্যাপারে প্রতিনিয়ত তদারকি করা।

২। প্রত্যেক সংসদের শিশু তথ্যপঞ্জী বা Child Register তৈরী করা, যাতে ওই সংসদে কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না তার তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় - এবং এই তথ্যপঞ্জীটি হালনাগাদ (UP-to-date) রাখা।

৩। অভিভাবক বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনজাতি ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বাবা মা এদের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে পাড়া বৈঠক করে সচেতন বাড়ান।

৪। জুলাই মাসে স্কুল ভর্ত্তির জন্য দু-এক মাস আগে থেকে উদ্যোগ নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এবং পদযাত্রী সভা সমাবেশের মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য আবেদন রাখা।

৫। আগষ্টে আরেকবার পাড়া অনুযায়ী দেখে নেওয়া কতজন শিশু ভর্ত্তি হল না এবং তাদের ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা।

৬। বিদ্যালয় ছুট শিশুদের পুনরায় ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করা।

৭। বিদ্যালয়হীন বসতিগুলিকে চিহ্নিত করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাব সংগ্রহ করা।

৮। শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে বলা তারা যেন বিদ্যালয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মনোযোগী হন ও শিক্ষায়তনে শিক্ষাদানের জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশ গঠন করেন।

৯। বইগুলি যাতে সঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছায় তার তদারকি করা।

১০। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোর তদারকি করা।

১১। শিশুশিক্ষা পরিচালন সমিতিগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখা। এই পরিচালন সমিতি গঠনের সময় (এই সমিতিতে ৯ জনের মধ্যে ৩ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও ৭ জন অভিভাবক যার মধ্যে অবশ্যই অন্ততঃ ৩জন অভিভাবিকা) শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান, এস.জি.আর.ওয়াই. বা ঐধরনের কোন কর্মসূচী খাতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে কেন্দ্রের গৃহনির্মাণের, পানীয় জলে ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

১২) স্কুলগুলিতে শৌচাগার নির্মাণ ও টিউবওয়েল বসানোর প্রস্তাব নেওয়া।

১৩) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে খাবার বিতরন ব্যবস্থার তদারকি করা।

১৪) এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষকমন্ডলীদের নিয়ে একটি প্রচায় অভিযান দল তৈরী করা। এই দলে জনমতও দলনির্বিশেষে সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে যুক্ত করা।

১৫) স্কুল সারাই ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষন করা। তবে প্রসঙ্গগত উল্লেখযোগ্য এই বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই সরকারী সহায়তার মুখাপেক্ষি হয়ে থাকলে হবে না - দরকার নিজস্ব উদ্যোগ। এর জন্য দরকার হতে পারে শ্রমদান ও প্রয়োজনে এলাকার মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সম্মিলিত কিছু অর্থসংস্থানের। আগে এভাবে উদ্যোগ নিয়ে অনেক স্কুল তৈরী হয়েছে; বর্তমানে হবে না কেন? এই সরকারের সীমিত ক্ষমতার প্রতি মুখাপেক্ষি হলে চলবে না। চাই নিজস্ব উদ্যোগ।

১৬) এলাকায় দারিদ্রের কারণে যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, তাদের পরিপূরক বা সহায়ক জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করার জন্য গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন রাখা।

১৭) বিপজ্জনক শিল্পে নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে প্রশাসনকে এবং জেলার চাইল্ড ইরারিকেশন সোসাইটিকে বিষয়টি অবহিত করা। এই শিশুশ্রমিক

বিদ্যালয় অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলায় বর্তমানে চালু আছে। বাকিগুলিতে শুরু হবে। এই প্রকল্পে পড়ুয়াদের মাসে ১০০টাকা করে সহায়তা দেওয়ার সঙ্গে 'মিড-ডে-মিল' বাবদ দিনে ২.৫০টাকা দেওয়া হয়।

১৮) গ্রামে ১০০টি ছোট্ট পাঠাগার তৈরী করে পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার উৎসাহ দেওয়া - এর জন্য জেলা মারফৎ গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সহায়তা পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র গড়ে তুলবার উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে।

১৯) সর্বপোরি দলমত নির্বিশেষে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হওয়া। উপরোক্ত বিষয়ে মূলতঃ শিশুদের শিক্ষা ও অন্যদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগের প্রসঙ্গে বলা হল - এছাড়া আছে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য জীবিকার চাহিদার উপর ভিত্তি করে কমিউনিটি পলিটেকনিক প্রকল্প গ্রহণ করা। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে গ্রামপঞ্চায়েতের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে যা বলা উচিত তা হল প্রত্যেক শিশুদের মধ্যেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রকৃতি সবচেয়ে বড় শিক্ষক - মানুষ নিজের প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করেছে। তবু শিক্ষার দরকার কেন? কারণ শিক্ষা গড়ে দেয় বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা, নিজের চেতনা, নিজের প্রতি মর্যাদাবোধ। শিশুকে জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা মায়ের তাকে সুষ্ঠ জীবনযাপনের জন্য উপযোগী করে তোলা উচিত এবং তা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। এই চেতনাটা অন্ততঃ সকল মানুষের মধ্যে জাগরুক হোক। এর দায়িত্ব কোন পঞ্চায়েত সদস্য কোন উন্নয়নকর্মী অস্বীকার করতে পারেন না। কোন শিশুশিক্ষার একাধিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শুধু চেতনার অভাবে ভবিষ্যতে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীভুক্ত হবে এটা মেনে নেওয়া যায় কি?

শিক্ষার জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে?

সাক্ষরতা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ী - প্রাথমিক বিদ্যালয় - এস.এস.কে - শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় - মাদ্রাসা - এছাড়াও অর্থবিভাগ, ত্রাণদপ্তর, স্বরাষ্ট্রবিভাগ, সংখ্যালঘু বিভাগ, UNICEF, DFID, UNESCO-র সহায়তা ইত্যাদি।

জনস্বাস্থ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আগে দেখা যাক জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কী কী জড়িত। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রটি হল-

(১) কোন জনগোষ্ঠীর সকল শিশু ও নাগরিকদে সুস্বাস্থ্য (২) দূষণমুক্ত পরিবেশ (৩) স্বাস্থ্যসম্মত জলনিকাশী ব্যবস্থা (৪) শিশুদের, গর্ভবতী মায়েদের এবং প্রসবের পর মায়েদের প্রকৃত যত্ন (৫) শিশুদের টিকাকরণ (গ) সর্বোপরি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা।

স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তিনটি বিশেষ ধারা কথা চিকিৎসকরা বলে থাকেন। এগুলি হল-

(১) সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য উপযোগী কার্যকলাপ (Promotive Health Care)

(২) রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা (Preventive Health Care)

(৩) অসুখের চিকিৎসা করা (Curative Health Care)

এর মধ্যে শেষেরটির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারবাবুদের ও চিকিৎসাকর্মীদের এখানে পঞ্চায়েত সদস্যদের কোন ভূমিকা নেই। কারণ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে পঞ্চায়েত সদস্যরা তার চিকিৎসা করবেন না। তাকে ওষুধ লিখে দেবেন না বা ডাক্তারবাবু/চিকিৎসাকর্মীদের কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিত পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুখের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর বিষয়ে তাদের অনেকটাই দায়িত্ব থেকে যায়। এগুলি হল কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, সেখানে কী কী নূন্যতম পরিকাঠামো দরকার, এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া তার সঙ্গে গ্রামীণ কোন প্রকল্প থেকে কীভাবে গ্রামের ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নতি ঘটান যায় সেই বিষয়ে যথাসাধ্য পরিকল্পনা করে সংসদে পেশ করা ও তার রূপায়ন করা। ডাক্তারবাবুরাও যাতে সুষ্ঠভাবে রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে সেদিকে খেয়াল রাখা তাদের কর্তব্য।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও রোগ প্রতিরোধ করার বিষয়টিতে পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

অনেকটাই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যার অর্থ রোগাক্রান্ত হবা আগে যাতে রোগটিই না হয় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অনেক ভালো (Preventive is better than cure) । এই দুটি ধারাতে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যা যা করণীয় তা হল-

ক) এলাকায় দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরী করা।

খ) স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীকে গুরুত্ব দেওয়া।

গ) নিরাপদ পানীয় কলের ব্যবস্থা।

ঘ) ধোঁয়াহীন চুলা বসাতে উৎসাহ দেওয়া।

ঙ) গ্রামের সামগ্রিক পরিবেশ ভারসাম্যকে সঠিক রাখার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

চ) সর্বোপরি সুস্বাস্থ্য বজরায় রাখার জন্য জনচেতনা তৈরী করা - এর জন্য সবার আগে দরকার বিদ্যালয়গামী শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন করা যাতে ভবিষ্যতের এই নাগরিকরা স্বাস্থ্য সম্মত বিধানগলি মেনে চলে এবং আগামীদিনে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সম্বন্ধে গুরুত্ব পায়।

রোগপ্রতিরোধের জন্য যে সব বিষয়ে নজর দিতে হবে তা হল -

ক) গর্ভবতী মাকে ও ভূমিষ্ট হবার পর শিশুকে টিকা দেওয়া সুনিশ্চিচ করা। এমন অনকে রোগ আছে যে রোগে শিশুরা সহজে আক্রান্ত হয় এবং তাদের দেহে প্রতিষেধক ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় ঐ রোগের প্রকোপ এমন হয় যে শিশুটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার বেশ কিছু ভাইরাস ঘটি রোগের (যেমন পোলিও) কোন চিকিৎসাই নেই - এর একমাত্র উপায় শিশু বয়সেই দেহে টিকাকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরী করা। নীচে একটি তালিকার মাধ্যমে গর্ভবতী মা ও শিশুকে কখন কী টিকা দিতে হবে তা জানান হল-

১) গর্ভবর্তী হবার পর দিতে হবে টিটেনাস টকসাইড টিকা, এতে প্রসবের পর মা ও শিশুর টিটেনাস হবার সম্ভাবনা নির্মূল হবে।

২) একই কারণে টিটেনাস টকসাইডের দ্বিতীয় টিকা বা বুস্টার ডোজ দিতে হবে ১নং টিকার ঠিক একমাস বাদে।

৩) জন্মের পর পর এক বছরের মধ্যে টিবি ও পোলিও রোগ প্রতিরোঘ করতে দিতে হবে বিসিজি ও পোলিও টিকা।

৪) জন্মের ছ'সপ্তাহ পর ডিপিটি ও পোলিও টিকা যাতে শিশুটিকে পোলিও সহ ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও টিটেনাসের কবল থেকে বাঁচান যায়। এর একমাস পর পর মোট আরও দুবার ঐ একই টিকা শিশুদির প্রয়োজন।

৫) জন্মের ৯ -১২ মাসের মধ্যে হামের জন্য মিজল ভ্যাকসিন।

৬) ১৮ - ২৪ মাসে ডিপিটি-বুস্টার টিকা ও পোলিও বুস্টার টিকা দিতে হবে।

৭) ৫ বছর বয়সে ডিটি বুস্টার টীকা।

৮) ১০ ও ১৬ বছর বয়সে টিটেনাস টীকা।

এগুলি সব যে কোন সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে বিনাপয়সায় দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞতার জন এই সুযোগ গ্রহণ না করায় আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিবছর অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

উপরোক্ত টিকাগুলি ছাড়াও প্রত্যেক পালস্ পোলিওতে শিশুদের পোলিও খাওয়ানো অবশ্যই উচিত।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতে মা ও শিশুদের জন্য তথ্যপুঞ্জী রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। এটি ECCR (ECCR হল Eligable Couple and Child Register - যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্ষম দম্পতি ও শিশুদের যাবতীয় তথ্য রাখে) থেকে হালনাগাদ করা যায়। এটি না পারলে অন্ততঃপক্ষে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ECCR -টি যাতে সঠিকভাবে হালনাগাদ থাকে তার তদারকি বাঞ্ছনীয়।

মনে রাখা দরকার এলাকার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পকেড় এই ECCR এর দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ এটি থেকে পাওয়া যায় এলাকার মা ও শিশুর সকল তথ্য গভবর্তী মা এর নথিভুক্তিকরণকোন মা গর্ভাবস্থায়

কোন স্তরে আছেন - কার টিকাকরন হয়েছে - ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শৃঙ্খল পদক্ষেপগুলি নিলে সুবিধা হবে -

ECCR থেকে জানা কারা গর্ভবতী এর সঙ্গে দরকার শিশুর জন্মের নিবন্ধীকরণও।	গর্ভবতী মা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিটেনাস নিয়েছেন কিনা ফলিকার বড়ি খাচ্ছেন কিনা	প্রসবের পর শিশু ঠিকমত টিকা নিচ্ছে কিনা।

মায়েদের পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী বিষয় সচেতন করা

শিক্ষা জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সদস্যরা সংসদ ভিত্তিক সদস্যদের মাধ্যমে এর তদারকি করলে খুবই ভালো হয়। প্রয়োজনে এই ব্যাপারে সহায়ক দলের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী /মহিলাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। স্বভাবতঃই গ্রামের মেয়েদের খবর এঁরা ভালো জানবেন এবং যে কোন স্বাস্থ্য সচেতনার বার্তা এদের মাধ্যমে গ্রামের মেয়েদের কাছে পৌছে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এঁরা একাধারে তথ্যসংগ্রহকারী ও বার্তাবহনকারীর কাজ করে।

গ) নবজাতকদের যত্নের ব্যাপারে সঠিক সচেতনতা তৈরী করা। শুধু এই বিষয়েই নয় সংশ্লিষ্ট উপসমিতি এইভাবে পানীয় জল, সংক্রামক রোগ দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তপরীক্ষা করান, ডায়োরিয়া হলে নুন চিনির সরবত খাওয়া, এসব অনেক ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করতে পারেন। এর শুরু হওয়া উচিত বিদ্যালয়গামী শিশুদের দিয়ে।

ঘ) স্যানিটেশনের ব্যাপারে প্রকৃত উদ্যোগ নেওয়া যাতে মলমূত্র থেকে রোগ না ছড়ায়। এই ব্যাপারে সদস্যদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝান গ্রাম ভিত্তিক বৈঠক করা ইত্যাদি।

ঙ) জনগণকে সরকারী পরিষেবে সম্বন্ধে অবহিত করা, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সদস্যদের স্ব-অবহিতকরণের জন্য নীচে ছক দেওয়া হল-

কোন স্তরে?	কী ব্যবস্থা	গঠন কি?	কী পরিষেবা দেয়
প্রথম স্তর প্রতি ৫০০০ লোকের জন্য ১টি, পাহাড়ি ও পশ্চাদপদ অঞ্চলে ৩০০০ লোক পিছু ১টি	স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	২জন স্বাস্থকর্মী (১জন মহিলা)	১। সপ্তাহে ৩দিন গর্ভবতী মায়েদের নথিভুক্তকরন, পরীক্ষা, টিটেনাস টিকাও ফলিকার ওষুধ দেওয়া, শিশুদের টিকা, ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা ও ওষুধ দেওয়া, কন্ডোম বিতরন। ২। বাকি দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসংযোগ করা।
দ্বিতীয় স্তর- ৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পিছু ১টি বা ৩০,০০০জনসংখ্যা (পাহাড়ী অঞ্চলে ২০,০০০) পিছু ১টি [বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত সদর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গঠন করা হয়েছে]	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC)	চিকিৎসক - ১ সুপারভাইজার - ২ নার্স - ২/৩ কম্পাউন্ডার - ১	১। উপকেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান ২। স্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ন ৩। রোগীর জরুরী/ প্রাথমিক চিকিৎসা ৪। বহির্বিভাগে রোগী দেখা ৫। রক্ত, কফ, থুতু পরীক্ষা ৬। প্রয়োজনে রেফার করবে
ব্লক স্তর প্রতি ব্লকে ১টি	ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)	BMOHসহ অন্যান্য নার্স, কম্পাউন্ডার, চিকিৎসাবলী	১। স্বাসথ্যকর্মসূচী রূপায়ন ২। চিকিৎসা (বহিঃবিভাগ ও হাসপাতালে রেখে) ৩। প্রয়োজনে রেফার করা।

এছাড়াও ১০০০জনসংখ্যা প্রতি থাকবে একজন প্রশিক্ষিত দাইমা ও একজন হোম গাইড।
এর উপরে আছে মহকুমা ও জেলাস্তরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো।
চ) স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের বিভিন্ন বাড়ির ভ্রমণসূচী (Tour Programm) পঞ্চায়েতে জমা দেন। সংশ্লিষ্ট উপসমিতির এই ব্যাপারে তদারকি করা।
ছ) নিকট ভবিষ্যতে গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক থাকবেন। যাদের কার্যালয় হবে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর। সংশ্লিষ্ট উপসমিতির দায়িত্ব এদের কাজে সহায়তা করা। এরা এই উপসমিতিরই একজন সদস্য হবেন।

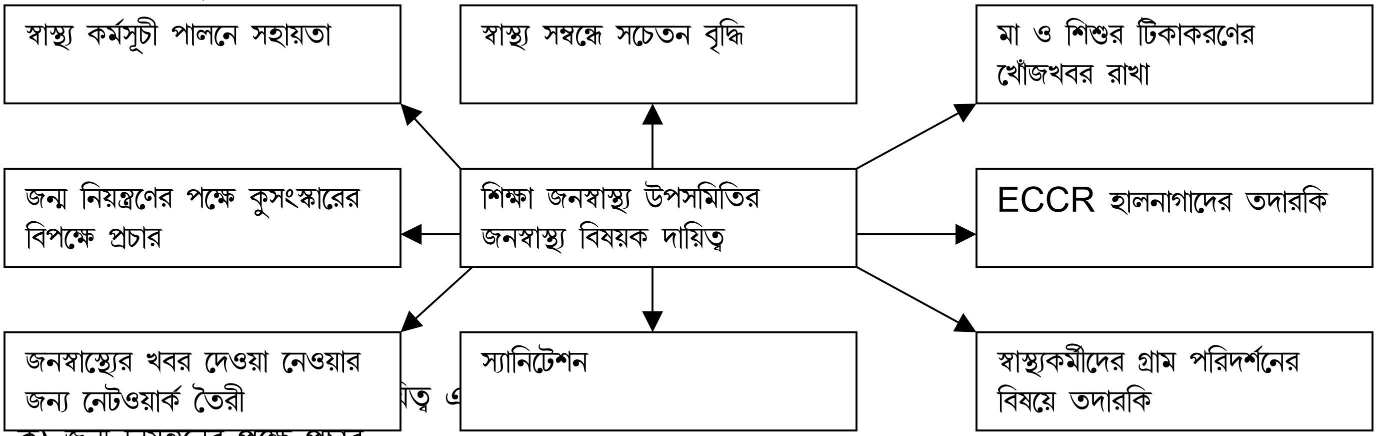

ক) জন্ম নিয়ন্ত্রনের পক্ষে প্রচার;
খ) পাল্স পোলিও কর্মসূচী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মসূচীগুলির সঠিক রূপায়ণে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র/প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করা।
গ) সমাজে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রচারাভিযান চালান, ১৮ বছরের নীচে বিবাহ বন্ধ করা।
ঘ) জন্ম ও মৃত্যু ও গর্ভবতী মায়ের নিবন্ধীকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও প্রচার অভিযান চালান।

পঞ্চায়েত সদস্যদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপসমিতি এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের মূল কাজ কিন্তু জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার। এলাকার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে হালনাগাদ তথ্যাবলী যাতে সঠিকভাবে রাখা হয় তা দেখা, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের তদারকি করা। এর মধ্যে জনসংযোগকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামে অশিক্ষার জন্য বহু মানুষের মৃত্যু হয়, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ভুল ধারনা থাকে। এগুলোর জন্য মানুষকে বোঝাতে হবে। এই সমিতিকে তার পূর্ণ সংগঠন নিয়ে দলমত নির্বিশেষে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছিল এই উপসমিতরি সদস্যরা ডাক্তারবাবু নন, তার পোলিও বা ম্যালিরিয়ে রোগের চিকিৎসা করবেন না বা চিকিৎসককে পরামর্শ দেবেন না বরং পোলিও টিকা নিলে পোলিও হয় না তা মানুষকে বোঝাবেন - কোন কোন শিশু পোলিও খেল না, কেন খেল না, সে সম্বন্ধে তথ্যাবলী রাখবেন বহুদিন ধরে জ্বর হলে থুতু বা পরীক্ষাটা অবশ্যই স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে করান উচিত তা মানুষকে বোঝাবেন।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য দুটোই সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা না থাকলে মানুষের দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ কম জন্মায় - এটা পরীক্ষিত সত্য। শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব একটি উপসমিতির আওতাধীন থাকায় এই উপসমিতির সুযোগ আছে বিদ্যালয়মুখী বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একই সঙ্গে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টিতে উদ্বুদ্ধ করার। আসলে এই উপসমিতির প্রধান কাজটাই কিন্তু জনচেতনা বৃদ্ধি করা। কারণ এটি ছাড়া শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য এই দুইয়ের কোনটিরই উন্নয়ন সম্ভব নয় সুতরাং এই উপসমিতির জনসংযোগের সুযোগও বোধহয় সবচেয়ে বেশী।